OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 97 - 106
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সর্বনামপদের রূপ ও প্রয়োগবৈচিত্র

ড. অমরকুমার পাল
সহকারী অধ্যাপক
পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার
Email ID : paul.amar633@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chandimangal, Manik Dutta, Pronoun, Linguistics.

Abstract
Till now, the poet Manik Dutta of Malda is considered to be the ancient poet of Chandimangal. Sunil kumar Ojha collected the main part of this poetry from the notebooks written by the singers in 1784 and published it as a book. As a result, the poetry edited by Ojha also depicts the contemporary language of the singers. The said poem by Manik Dutta is very important in the judgment of Bengali linguistics. The poem creates a bridge between the middle-ages and the modern era of Bengali language. And the thing that attracts the most attention while analyzing the language of Manik Dutta's poem is the pronoun. The well-decorated, developed form of the pronoun in the Bengali language in the modern era seems to have its roots in Manik Dutta's poetry.

Discussion

এখনও পর্যন্ত মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলা হয়। চণ্ডীমঙ্গলের এই আদিকবির পুথি নিয়ে নানান সমস্যা থাকলেও শ্রীসুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কাব্যটি যে অনেকটাই সম্পূর্ণ, তা অনেকেই স্বীকার করেছেন। তবে একথা স্মর্তব্য যে, সুনীলকুমার ওঝা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে খুব একটা প্রাচীন পুথি অবলম্বন করতে পারেন নি। তিনি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা পুথি দেখে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সেই সম্পাদিত গ্রন্থের প্রারম্ভে 'চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে দু'চার কথা' অংশে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, -

> "এ রচনাটির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে বাঞ্ছিত ছিল। সে বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এখন শ্রীমন সুনীলকুমার ওঝা। ইনি খুব একটা প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন না করলেও এঁর প্রধান অবলম্বন হল ১১৯১ সালে (১৭৮৪ খ্রি:) লেখা প্রায় সমাপ্ত একটি পুঁথি। এছাড়া তৎপরবর্তীকালের কয়েকখানা পালার ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি এবং চণ্ডীমঙ্গল গায়কদের নিজ প্রয়োজনে পুঁথি দেখে লেখা খাতা। এই গ্রন্থটির দোষ হল এই যে এটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে পাওয়া ভিন্ন ভিন্ন পালার সংহিতা। আর বইটির গুণ হল এই যে, এটিতে চণ্ডীমঙ্গলের যথাযথ পাঠ যেন গায়কের মুখ থেকে ধরে দেওয়া হল।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমরা জানি ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক ভাবে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। তাই সুনীলকুমার ওঝা যে সময়ের পুথি দেখে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা করেন সেই সময়কাল আন-অফিসিয়ালি আধুনিক যুগের চৌকাঠ ছুঁয়ে ফেলেছে। সুতরাং ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে যে খুব একটা প্রাচীনত্বের আস্বাদন পাওয়া যাবে না, তা কষ্টকল্পিত নয়। আমরা মানিক দত্তের সেই কাব্যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রূপতত্ত্বের যে অন্যতম উপাদান সর্বনাম পদ, তার রূপবৈচিত্র নিয়ে আলোচনায় অগ্রসিত হবো।

রচয়িতার রচনায় তাঁর মাতৃভাষার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাই যে কোনও রচনার ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্বে রচয়িতার জন্মস্থান ও যাপনস্থান জানা জরুরী হয়ে পড়ে। মানিক দত্ত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যে ফুলবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনপদের নানান পরিচয় রয়েছে। এই অঞ্চলটি উপভাষিক বিভাজনের নিরিখে বরেন্দ্রী উপভাষার মধ্যে পড়ে। উল্লেখ্য যে, 1898-1927 সাল পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের ‘Linguistic survey of India’। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে মালদহ অঞ্চলের ভাষাজরিপ করার সময় এই অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা দেখে গ্রিয়ার্সন সাহেব বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন, -

> “Malda District is a meeting-place of several languages, - of Bengali, Bihari, Santali, Koch and others. Curiously enough language is distributed by race, rather than by locality, so that in one village four or five languages may be heard spoken.”[২]

প্রসঙ্গটি উত্থাপনের কারণ হল, এই অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা যে স্থানের চেয়ে জাতি বা সম্প্রদায় অনুযায়ী বেশি পরিবর্তিত হয়, তা স্মরণ না রাখলে ভুল পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

আঞ্চলিক ভাষা বিশ্লেষণে মালদহের ভাষার স্বতন্ত্রতা খুব সহজেই চোখে পড়ে। যা মানিক দত্তের কাব্যেও স্বভাবতই পড়েছে। তবে এইকথাও স্মর্তব্য যে, আবিষ্কৃত পুথিগুলি কিন্তু সবই মালদহের ছিল না। উত্তর দিনাজপুর থেকেও সুনীলকুমার পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরদিনাজপুর অঞ্চলটি আবার উপভাষা বিভাজনের নিরিখে রাজবংশীর অন্তর্গত। তাই বরেন্দ্রী এবং রাজবংশী এই দুই উপভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায় ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক যে পুথিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেইগুলি ছিল পালাগানের গায়েনদের। চণ্ডীমঙ্গলের গায়কেরা পালাগান গাইবার প্রয়োজনে অনেক সময় খাতায় কপি করে রাখতেন সেইসব পুথি। কপি করতে গিয়ে আবার সেইসব পুথিতে কপিকারের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়ত। তাই মূল রচয়িতার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে কপিকারের আঞ্চলিক ভাষা মিলেমিশে বর্তমান সম্পাদিত গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আর সুনীলকুমার ওঝার কাব্যটি খুব প্রাচীন না হওয়ায় হাল আমলে প্রচলিত বেশ কিছু সর্বনামও সেই কাব্যে লক্ষ করা যায়।

আমরা জানি, যে সব পদ নামপদ বা বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাদের সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম পদ মূলত বাক্যের প্রথমেই বসে। তাই বলা হয় ‘সর্বাদিনী সর্বনামানি’। সংস্কৃত ভাষায় সর্বনামের উত্তম ও মধ্যম পুরুষে লিঙ্গভেদ নেই, অন্য সর্বনামে এবং সর্বনামঘটিত বিশেষণে রয়েছে। এই রীতি প্রাকৃত পর্যন্ত বহমান ছিল। অপভ্রষ্টে প্রধানত মুখ্যকারকে (অর্থাৎ কর্তা ও কর্ম) লিঙ্গভেদ থাকলেও অন্য কারকে সেই ভেদাভেদ একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর সবশেষে প্রাচীন বাংলায় এসে সর্বনামের লিঙ্গভেদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৩] সর্বনামগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়— পুরুষবাচক এবং নির্দেশক। তবে সব মিলিয়ে বাংলা সর্বনাম আট প্রকার। যথা— ১। পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক (Personal) ২। নির্দেশক (Demonstrative) ৩। অনির্দেশক (Indefinite) ৪। সমষ্টিবাচক (Inclusive) ৫।সংযোগবাচক (Relative) ৬। প্রশ্নবাচক (Interrogative) ৭। আত্মবাচক (Reflexive) ও ৮। পারস্পরিক (Reciprocal)। আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপর্যুক্ত সর্বনামগুলির বিভিন্ন প্রকার ও রূপ এবং সেগুলি কোন কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা দেখে নেব।

১। পুরুষবাচক সর্বনাম (Personal Pronoun) : যেসব সর্বনাম ব্যক্তি বা পুরুষের নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের পুরুষবাচক সর্বনাম বলে। বাংলায় পুরুষবাচক সর্বনাম তিন প্রকার, যথা— ক) উত্তম, খ) মধ্যম ও গ) প্রথম। বাংলা সর্বনামের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, কর্তৃকারকে শব্দের যে রূপ ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে অন্যান্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারকের রূপ গঠিত হয় না, সেই রূপ গঠন করতে শব্দের সঙ্গে প্রাতিপদিক যুক্ত করতে হয়। তাই প্রত্যেক সর্বনামের দুইটি করে রূপ বিদ্যমান। এইবারে মানিক দত্তের কাব্যে ব্যবহৃত পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলি আমরা দেখে নিতে পারি—

১. ক। উত্তম পুরুষবাচক (First Personal) : আধুনিক মান্য বাংলায় উত্তম পুরুষবাচক সর্বনামের একবচনের রূপ হল আমি, আমাকে, আমার, মোর এবং বহুবচনের রূপ হল আমরা, আমাদের, আমাদিগকে প্রভৃতি। 'আমি' শব্দটির উৎস দুই রকম ভাবে পাওয়া যায়। প্রথমত, (সংস্কৃত) অস্মাভি> (প্রাকৃতে) অমহাহি> (অপভ্রংশে) অমহহি> (প্রাচীন বাংলায়) অমহে, আম্মে, আম্ভে, অম্মে, অম্ভে> (মধ্য বাংলায়) আম্মে, আমি> (আধুনিক বাংলায়) আমি। দ্বিতীয়ত, (সং) অস্মে> (প্রা) অমহে> (প্রা বাং) অমহে> (মধ্য-বাং) আম্মি, আমি> (আধু-বাং) আমি।

চর্যাপদে আমরা দেখি সংস্কৃত 'অহম্' থেকে সৃষ্ট 'হাঁউ' কর্তৃকারকে 'আমি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী' (১০ নং চর্যা), 'হাঁউ নিরাসী খমন-ভতারি' (২০ নং চর্যা)। তবে সেখানে 'আম্মে' (১১ ও ২২ নং পদ) এবং 'অমহে' (৪ ও ১২ নং পদ) সর্বনামকেও 'আমি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখি।

ওঝা সম্পাদিত গ্রন্থে আমরা দেখি উত্তম পুরুষের এক বচনের সর্বনাম পদ হিসেবে সেখানে আধুনিক কালের রূপ 'আমি' ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও 'আমি' সর্বনামের যথেষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি,

'তখন আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিআনে।।'(পৃ - ১)
'আমি জাকে জন্ম দেই তুমি দেহ স্থান।।'(পৃ - ২)
'শিব বোলে শুন দুর্গা কহি আমি বাণী।।' (পৃ - ২৫)
'আমি নানা মতে বিজু বন করিব সৃজন।।' (পৃ - ৪৩) প্রভৃতি।

আবার কোনও কোনও স্থানে 'আমি' সর্বনামের বানান হিসেবে 'য়ামি' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'শিব পূজার পুষ্প য়ামি জাই তুলিবারে' (৫৭), 'ব্যাধ ঘরে জন্ম তুমি শাপ দিলাঙ য়ামি' (৬০), 'জে মতি আরজিয় য়ামি/ তেমতি সাফ কর তুমি' (১৩৬) প্রভৃতি। খুবই কম হলেও দুই-একস্থানে কর্তৃপদের একবচনের রূপ হিসেবে 'আমি' বা 'য়ামি' প্রয়োগ না হয়ে 'মুঞি' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন - 'দেবি বোলে পদ্মা মুঞি বোলো তোমারে' (১৬৩), 'মুঞি দেবি দশভূজা' (১৬৪), 'মুঞি তারে দিল ধন' (১৬৪)। আমরা জানি সংস্কৃত 'ময়া' থেকে প্রাচীন বাংলায় 'মই', 'মোএ' এবং মধ্য বাংলায় 'মোই', 'মুঞি', 'মুই' এর আগমন ঘটে। মানিক দত্তের কাব্যে 'আমারে' এর স্থলে 'য়ামারে' এবং 'আমার' এর স্থলে 'য়ামার' পাওয়া যায়। যথা- 'য়তএব জানিলাম তাহা নহিল য়ামারে' (১৩৪), 'মন্দ জানি বল য়ামার প্রজা লোকের তরে (১৩৪)।

তবে কিছু ক্ষেত্রে 'আমারে' এবং 'আমার' বানানও দেখা যায়। যেমন-'ভক্ত হইয়া গোপ্ত রূপ দেখিলে আমারে' (১০৮), 'গোপ্ত কথা আর জানি পুছহ আমারে' (১০৯)। খেয়াল করলে বোঝা যায় দুই ক্ষেত্রে 'আমারে' পদের অর্থ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে 'আমার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'আমারে' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'আমাকে' অর্থে। অর্থাৎ একই পদ তার বেশবদল না করে কোথাও হচ্ছে সম্বন্ধ পদ আবার কোথাও বা গৌণকর্ম। শব্দের এই বর্গান্তর ঘটার প্রক্রিয়াটি আধুনিক বাংলা ভাষাতেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ধ্বনিমূলের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে মধ্যযুগের ধ্বনিমূলের অবস্থানগত পার্থক্যও পরিস্ফুটিত হয়েছে এখানে। বাংলা বর্ণমালার একটি অর্ধস্বর হল 'য়' বর্ণটি। বাংলায় যে দুইটি অর্ধস্বর রয়েছে সেগুলি দিয়ে বাংলা অক্ষর এবং শব্দের সূচনা খুব কমই হয়। বিদেশী 'ইয়ার', 'এয়ার', 'ইয়োরোপ', 'ওয়ার্ড' ইত্যাদি শব্দে ছাড়া আদৌ হয় কিনা তা তর্কসাপেক্ষ।[৪] 'য়' বর্ণটিকে আমরা বর্তমানে পদের প্রথমে প্রয়োগ করতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে তা পদের প্রথমেই ব্যবহৃত হত। আমার অর্থে কখনো কখনো আবার 'আমা' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'জদি কথা মিথ্যা হয় শুন আমা স্থানে' (৩২০)।

'আমরা' পদটির প্রাতিপদিক হল 'আমা'। এর উদ্ভব হিসেবে দুইটি উৎস পাওয়া যায়। প্রথমত, সং. অস্মাকম্> প্রা. অমহাকং> অপ. অমহাঅঁ> প্রা.বা. অমহা> ম.বা. আম্মা> আ.বা. আমা। দ্বিতীয়ত, সং. অস্মাম্> প্রা. অমহং> প্রা.বা. অমহ> ম.বা. আম্মা> আ.বা. আমা। এই 'আমা'-এর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমরা, আমাগো, আমাগোর প্রভৃতি। এটি হল উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন, প্রথমে 'মো' ('ম-') ছিল একবচনের প্রাতিপদিক, 'আমা-' বহুবচনের। প্রাচীন বাংলার শেষে 'আম-' একবচনেও চলিত হয়। মধ্য বাংলায় তাই নতুন

করে বহুবচনের পদ তৈরি হয় 'আম্মারা'।[৫] চর্যাপদে আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ হিসেবে পাওয়া যায় আমহে, মো, আম্মে, আহমে। মানিক দত্তের কাব্যে 'য়ামি' বা 'আমি; উত্তম পুরুষের বহুবচনের রূপ পাওয়া যায় 'য়ামরা' বা 'আমরা'। যথা- 'গন্ধর্ব বোলেন মাতা য়ামরা করি গান'(বুধবার দিবসের পালা)। উত্তরবঙ্গে উত্তমপুরুষের একবচনের সর্বনাম হিসেবে 'হামি' এবং বহুবচনের সর্বনাম হিসেবে 'হামরা'র ব্যাপক প্রচলন বর্তমানেও রয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন Northern Bengali অঞ্চলের ভাষার সর্বনাম প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

> "In ragard to the Pronouns, the pronoun of the first person is haami, I. Its Accusative-Dative Singular is haamaake, or haamaak,its Genitive Singular is haamaar, and its Nominative Plural is haamraa."[৬]

তবে মানিকদত্তের কাব্যে 'হামি' অথবা 'হামরা'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন বাংলায় 'মো' একবচনের প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করে তির্যক কারকের পদ নিষ্পন্ন হয়েছিল। যেমন কর্তা-মো; সম্বন্ধে-মোর, মোরি (প্রা-বা)। কর্ম-সম্প্রদান মকুঁ (প্রা-বা), মোক, মোকে, মোরা, মোরে। অধিকরণ মোত, মোতে। করণ মোতে (ম-বা)। প্রা-বা সম্বন্ধে 'মোহোর'।[৭] মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে 'মোর'/'য়ামার', 'মোকে'/'আমাকে', 'মোরে/'য়ামারে' প্রয়োগ করেছেন উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম পদ হিসেবে। যথা- 'দআ করি মোর স্বামী হঅ প্রভু তুমি' (৯), 'নিরামিশের ঘাটে মোকে করাহ দাহন' (৪), 'কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে' (৯), 'দুর্গা বোলে শিব ঠাকুর কেন ভাণ্ড মোকে' (৯), 'আমাকে দেখিয়া বেটা না করিল শঙ্কা' (১৩৫), 'পাগলের বড়াই কর মোর বিদ্যমান' (১৩১), 'দুই পুত্র হৈল মোর পরম সুন্দর' (২৪), 'গণেশ কার্ত্তিক মোর করুক পালন' (২৫), 'মোর নাম অসুর দলনী দশভুজা' (২৮), 'হনু বোলে কে মোকে করিল স্মরণ' (২৯), 'রাজা বোলে শুন মা মোর নিবেদন' (৪০), 'কি মতে হইবে মোর ব্রতের সৃজন' (৪৬), 'অল্পজ্ঞান করি তুমি কর মোর পূজা' (৫৯), 'সুরপুরি বাম হৈল স্থুল দেহ মোরে' (৬২), 'মা জানিয়া বিচার কর মোরে' (৭৫), 'দুই গোটা কন্ন কেবল মোর প্রাণের বৈরি' (৭৭), 'সুযুক্তি দেহ মোকে যে আইসে বিচারে' (৮২), 'ভালমন্দ না জানে ব্যাধ বান্ধে মোর তরে' (৮২), 'কালকেতু আনিলে মোকে সত্য বাক্য দিয়া' (৯৬), 'দুর্গা বলে কেন বিদায় দেহ মোরে' (১০৫) প্রভৃতি। এইরকম দৃষ্টান্ত আরও প্রচুর রয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। লক্ষণীয় যে, 'মোকে' এবং 'মোরে' এই দুই রূপই গৌণকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'মোর' ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে। গৌণকর্মের রূপ হিসেবে মানিক দত্তের কাব্যে 'মোকে' এর স্থলে 'মোখে'ও দেখা যায়। গায়েনদের মুখে মুখে উচ্চারণে মহাপ্রাণীভবনের জন্যে এমনটি ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, -

> "ইহাদের যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র গৌড়-বঙ্গদেশ(অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। এই বর্ণগুলির দুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গে (গৌড় দেশে) শোনা যায়; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ববঙ্গে (বঙ্গ দেশে) মিলে।"[৮]

এই প্রসঙ্গে ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক জানিয়েছেন, -

> "প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে মহাপ্রাণধ্বনির আগম কেবল গানের ক্ষেত্রেই নয়, কথ্যভাষাতেও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।"[৯]

সর্বনামপদের ব্যবহারেও মহাপ্রাণীভবন ঘটেছে মানিক দত্তের কাব্যে। যেমন, বৃহস্পতিবার রাত্রির পালায় দেখি কালকেতু দেবী চণ্ডীকে বলছে 'কেতু বলে মোখে জদি তুমি দেহ ধন'।

১. খ। মধ্যম পুরুষবাচক (Second personal) **:** মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনামের ব্যবহার বাংলায় বেশ বৈচিত্রময়। তুচ্ছার্থে, সাধারণ অর্থে এবং সম্মানার্থে এর রূপ ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তুই, তোরা তুচ্ছার্থে; তুমি, তোমরা সাধারণ অর্থে এবং আপনি, আপনারা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানিক দত্তের কাব্যে আমরা মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিন ধরণের রূপেরই সন্ধান পাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডক্টর সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'যুষ্মদ' শব্দের অর্থাৎ মধ্যমপুরুষের প্রাতিপদিক পাই প্রধানত দুইটি, 'তো' এবং 'তোম্মা'। 'তো' এসেছে সম্বন্ধ একবচন 'তব' থেকে, আর 'তোহ্মা' এসেছে সম্বন্ধ 'তুষ্মাক(ম)' থেকে। গোড়ার দিকে 'তো' ছিল একবচন, 'তোম্মা' বহুবচন। প্রাচীন বাঙ্গালাতেই 'তো' সাধারণ এবং তোম্মা' সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিকে পরিণত হয়েছিল।[১০] আধুনিক বাংলায় মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমসূচক রূপ হল 'আপনি'। যা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের পূর্বে খুব বেশি বাংলা সাহিত্যে দেখাযায় না। মানিক দত্তের কাব্যেও কিন্তু 'আপনি' সর্বনামকে মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক রূপ হিসেবে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ও খুঁজে পান নি। তিনি ভূমিকার এক অংশে তাই জানিয়েছিলেন, -

> "গৌরবে মধ্যমপুরুষের 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এই গ্রন্থে কোথাও নাই। যে প্রয়োগগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা সবই 'নিজ' অর্থে।"[১১]

তবে আমরা অন্বেষণ করে দেখেছি সংখ্যায় খুব কম হলেও মানিক দত্তের কাব্যেও কিন্তু মধ্যম পুরুষের গৌরবার্থক রূপ হিসেবে 'আপনি' পদের ব্যবহার রয়েছে। যথা—

'দুখী দাসে তরা করি তরাহ আপনি' (৩৩১)
'দানাকে স্মরণ করি আনাহ আপনি' (৩৩৮)

অনেকক্ষেত্রে আবার 'আপুনি' পদ দ্বারা 'আপনি'কে বোঝানো হয়েছে। যেমন—

'ধরিঞা কোতাল বধ করহ আপুনি' (৩৩১)
'মশানে কাটিতে চায় তরাহ আপুনি' (৩৩১)

তবে আত্মবাচক সর্বনাম পদ হিসেবেই মানিক দত্তের কাব্যে আমরা 'আপনি' 'আপুনি' প্রভৃতি পদের বেশি ব্যবহার পাওয়া যায়।

আমরা জানি আধুনিক বাংলায় কীভাবে তুই, তুমি এবং তোমা–এর আগমন ঘটেছে— সং. ত্বয়া (করণ)> প্রা. তএ, তুএ> প্রা. বা. তই, তোএ> আ. বা. তুই এবং সং. তুষ্মে> প্রা. তুমহে> প্রা. বা. তুমহে> আ.বা. তুমি আবার সং. তুষ্মাকং> প্রা. তুমহাকং> অপ. তুমহং> প্রা.বা.> তোমহা> ম.বা.> তোম্মা, তোহাঁ, তোমা। তোহ্মার তির্যক কারকের প্রাতিপদিক তোহ্মার> আ.বা. তোমার। তোহ্মাক> তোমাকে, তোহ্মাত> তোমাতে। মধ্যম পুরুষে 'তু', 'তুম' প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে তার সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে পদ নিষ্পন্ন হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। আর এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে তুই, তুমি। এছাড়াও অন্যান্য কারকের রূপ তৈরির ক্ষেত্রে 'তো' 'তু', 'তোমা' প্রাতিপদিকের ব্যবহার দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানিক দত্তের কাব্যে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ দেখে নেওয়া যেতে পারে—'বিবাহ করহ তুমি' (পৃ - ৫), 'শিব বোলে শুন তুমি' (পৃ - ৫), 'শিব ঠাকুর বলে দুর্গা বর চাহ তুমি' (পৃ - ৯), 'মুনি বোলে শিব কেন আল্যা তুমি' (পৃ - ১০), 'হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারণ' (পৃ - ১৫), 'তুমি জাঞা রণ করি মার অসুরগণ' (পৃ - ২০), 'তুমি জারে সদয় মাগো তারে কিবা দুখ' (পৃ - ৪০), 'সু লগ্ন করিয়া পুত্র বিভা দেহ তুমি' (পৃ - ৫৩), 'আইলাম তোমার ঘরে জা কর তুমি' (পৃ - ১০৫), 'তুমি ভাঙ্গিলে আমার কলিঙ্গের শাসন' (পৃ - ১৪৬), 'তোর নারী ফুলরা সতীন করিয়া বলে' (পৃ - ১০৫), 'তোর দুঃখ দেখিয়া প্রসন হৈলাঙ আমি' (পৃ - ২৩২), 'তোর গৃহে আমরা না করিব ভোজন' (পৃ - ২৪৮), 'সে মূর্তি দেখিতে জদি সাধ গেল তোরে' (পৃ - ১০৭)। এখানে 'তোর' অর্থে 'তোরে' ব্যবহৃত হয়েছে। 'অর্ধ রাজ্য আমি তোরে দিবত তক্ষন' (পৃ - ২৭৬)। 'সে দেবে তোমাকে দিবে বর' (পৃ - ৫০), 'তব গৃহে আমার শ্রীমন্ত নাকি আছে' (২৮৭), 'ঢালিলাঙ তব পদে আপন জীবন' (৩৩০) 'তোক উদ্ধারিবে শ্রীমন্ত সদাগর' (২৮০), 'সেবক জানিয়া তোকে জানি ভালে' (২৮), 'মহারাজা থাকিতে বেটা তোকে সাদ লাগে' (১৪৯), 'দ্বারেথুইয়া তোখে আইলাম আমি' (১৪৮) প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, কর্মকারকের রূপ 'তোকে' কিছুক্ষেত্রে মহাপ্রাণীভবনের ফলে 'তোখে' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কর্মকারকের রূপ হিসেবে যেমন তোক, তোকে, তোমাকে পাওয়া যায় তেমনই 'তোরে' দিয়েও অনেকসময় কর্মকারকের রূপ বোঝানো হয়েছে। মধ্যম পুরুষের এক ধরণের ব্যবহার মানিক দত্তের কাব্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল তোরে, তোর এই পদের কর্তার রূপ কিন্তু 'তুই' হয় না। তা হয়ে যায় তুমি। যেমন, 'অষ্টবিংশতি বৎসর মর্থে বৈভোগ তোরে/ পুনশ্চ আসিবে তুমি অমরা নগরে' (১৮৯), 'জে বাক্য বলিলাম আমি সেই দিব তোরে/ তুমি পুত্রবতী হৈবে উজানী নগরে' (২৬৭)। অর্থাৎ বক্তা একই ব্যক্তিকে যখন উদ্দেশ্য

করে কথা বলছেন তখন কর্ম, করণ, অপাদানে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ রূপ প্রয়োগ করলেও কর্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন সাধারণ রূপ।

এই গ্রন্থে আধুনিক কালের অনেক ভাষিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যম পুরুষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রূপ তঁই, তুঁহু এই গ্রন্থে একেবারেই দেখা যায় না। তবে আধুনিক যুগের মধ্যম পুরুষের রূপ 'তোমার' এর স্থলে এই কাব্যে 'তুমার' এর প্রয়োগ দেখা যায়। স্মর্তব্য যে, বরেন্দ্রী অঞ্চলের ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল শব্দের আদি 'ও' কে অনেক সময় 'উ' হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 'তোমার' হয়ে যায় 'তুমার'। মানিক দত্তের কাব্যেও সেই বৈশিষ্ট্য রেখায়িত হয়েছে, 'আদ্যা জনম তুমার সৃষ্টি রক্ষার তরে' (পৃ - ৬), 'তুমার মরণে শিব হবেন অজ্ঞান' (৬), 'মুনি বোলে আছে তুমার কন্যা গৌরি' (পৃ - ৯), 'তুমার নারি গঙ্গা যদি করএ রন্ধন' (১০), 'মেনকা বলেন রাজা ভাল তুমার জ্ঞান' (পৃ - ১৫), 'তুমার মহিমা ব্যাস পুরাণে লিখিল' (১৯) প্রভৃতি। 'তুমার' পদটি কখনও কর্তা আবার কখনও সম্বন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. গ। প্রথম পুরুষবাচক (Third Personal) : বাংলায় প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামপদের একবচনের রূপগুলি হল, সে, তিনি, তাঁরএবং বহুবচনের রূপ হল তারা, তাঁরা, তাহারা, তঁদের, তাহাদিগকে প্রভৃতি। সাধারণত অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সর্বনামগুলি ব্যবহৃত হয়। মানিক দত্তের কাব্যে প্রথম পুরুষবাচক সর্বনামগুলির ব্যবহার দেখে নেওয়া যাক—'ব্রহ্মাকে ছাড়িয়াছাড়িয়া ভাসিয়া সে জাএ' (৪), 'সে দেবে তোমাকে দিবে বর' (৫০), 'সে লইয়া জায়ে মারিয়া খাইতে' (৮০), 'সেবক বলিয়া তার কিছু চিন্তা নাই আর' (৫০), 'পুত্র তার মালাধর' (১৮৬), 'গলে হার বাহে তার শঙ্খ পদ্মে হাতে' (৩৫৭), 'তার দেশে বৈসে ধনপতি সদাগর' (৩৭৪), 'দুইটা শৃকাল আসি নোওাইল মাথা/ তারে বর দিল কালি জগতের মাতা' (৭৬)। লক্ষণীয় যে, এখানে 'তারে' সর্বনাম পদটি কিন্তু প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারে' এর অর্থ এখানে 'তাদের'। 'পৃথিবী ধরিতে আঙ্গা তাহাকে করিল' (২), 'তাকে বিভা কিরূপে করিবো' (৫), 'তাকে হব বরদায়' (৩০), 'সকল ইনাম তাক দিল' (৬৬), 'পদ্মা করেন তাক শ্বেত চামরের বাও' (৩৭২)। কর্মকারকের রূপ হিসেবে 'তাহাকে', 'তাকে' এবং 'তাক' এই তিনরূপই ব্যবহৃত হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। এছাড়াও গৌণ কর্মের রূপ হিসেবে দুই-এক জায়গায় 'ওহাক' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'সেহি সে পারিবে ওহাক দুঃখ দিবার তরে' (১২৫)। 'তেহো' সর্বনামের দ্বারা 'সেও' বোঝানো হয়েছে। যেমন, 'দিবসে দিবসে তেহো বাড়িতে লাগিল' (১৮২)।

২। নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative) : যে সব সর্বনাম কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের আমরা নির্দেশক সর্বনাম বলে জানি। নির্দেশক সর্বনাম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই প্রকার বস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করে। প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে সাধারণ ও সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে একবচনের ক্ষেত্রে এ, এই, ইহা এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে ইহারা, এরা, ইহাদিগের, এদের ব্যবহৃত হয়। আবার সম্মানার্থে একবচনের ক্ষেত্রে ইনি, ইঁহা, এঁ এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে ইঁহারা, এঁরা, ইঁহাদিগের, এঁদের, ইঁহাদের ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপ্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে একবচনে ইহা, এই, এটা, এটি, এখানা, এখানি এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে এ-সব, এগুলা, এগুলি, এ সমস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পরোক্ষ ক্ষেত্রে প্রাণীবাচক শব্দের সাধারণ অর্থে একবচনের রূপ হিসেবে দেখা যায় ওই, উহা, ও আর বহুবচনের ক্ষেত্রে উহারা, ওরা, উহাদিগের, ওদের। গৌরবার্থে একবচনের রূপ হল উনি, উহা, ওঁ আর বহুবচনের রূপ হল উঁহারা, ওঁরা, উঁহাদের, ওঁদের প্রভৃতি। অপ্রাণীবাচক শব্দে একবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় উহা, ওই, অই, ঐ, ওটা, ওখানা, ওখানি আর বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ঐ-সব, ওগুলা, ওগুলি প্রভৃতি।[12] আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মানিক দত্তের কাব্যে যেসব নির্দেশক সর্বনামের পরিচয় পাই তাদের নিকট নির্দেশক এবং দূর নির্দেশক হিসেবে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসরমান হবো।

২. ক। নিকট নির্দেশক (Near Demonstrative) : এ, ইনি নিকট নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে আধুনিক মান্য বাংলায় ব্যবহৃত হয়। একবচনে কর্তৃপদে এ, এটা কর্মে একে, এটাকে, করণে এর দ্বারা, একে দিয়ে নিমিত্তে একে, এটাকে, এর

জন্যে, অপাদানে এর থেকে, অধিকরণে এতে এবং সম্বন্ধে এর এবং বহুবচনে ক্রমান্বয়ে এরা-এসব-এগুলি, এদিগকে-এদেরকে, এদের দ্বারা-এদের দিয়ে, এদিগকে-এদের জন্যে, এদের থেকে, এদের মধ্যে এবং এদের এই রূপগুলি আধুনিককালে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। সংস্কৃত 'এভিঃ' প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় হয় 'এহি', যার আধুনিক কালের রূপ হল 'এই'। আর 'ইনি' এসেছে সংস্কৃত 'এষাম' থেকে। যা প্রাকৃতে হয় 'এনহং', অপভ্রংশে 'এণ' বা 'ইণ', মধ্য বাংলায় 'এনা', 'ইহ্নি', 'এই' এবং আধুনিক বাংলায় 'ইনি'। মানিক দত্তের কাব্যে নিকট নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে 'ই', 'এই','এহি' 'ইহা' 'ইহ' 'এ' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-'ই তিন ভুবন মধ্যে ব্রহ্মা একজন' (৪), 'এই দুঃখে কালকেতু মরে' (৮০), 'ই হেন মোহন বেশ জদি আছে তোরে' (৯১), 'চলহে সুন্দরি পথ অনুসারি ই তোর ব্যবহার নয়' (৯৪), 'একা হৈয়া জিনিলাম ই চারি দুয়ার' (১৫৪), 'বীর করুনা করে ই মহী মণ্ডলে' (১৬৩), 'ই কথা শুনিল যদি গণকের তুণ্ডে' (২৬৭), 'ই কথা শুনিয়া জম বলে সাজ সাজ' (৩৭১), 'এই দুঃখে কালকেতু মরে' (৮০), 'এই কথা দুর্গা মাতা করিছে মন্ত্রনা' (২১২), 'বিষ্ণু দত্ত বলে এই পরীক্ষাএ লয়' (২৫১), 'এহি গুধিকা তুমি করগা রন্ধন' (৮০), 'এহি পথে নোকাতে গেল মোর প্রাণস্বামী' (২৮১), 'এহি ডিঙ্গা রাখ মোর ব্রতের কারণ' (২৭২),'ইহা শুনি বলে কিছু নীলাম্বর দাস' (২৪৭), 'ইহ সাক্ষী দিলে হবে নরকে গমন' (১৭৪), 'এ বাক্য শুনিয়া শিব বড় তুষ্ট হৈল' (১৭৮), 'গতি নাই এ সময় তুয়া বিনা আর' (৩২৯)।

২. খ। দূর নির্দেশক (Far Demonstrative) : মান্য বাংলায় দূর নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত সর্বনামগুলির একবচনের রূপ হল ও, উহা, উনি এবং বহুবচনের রূপ হল ওরা, উহারা, ওনারা প্রভৃতি। সংস্কৃত 'অব' বা 'অবৎ' থেকে অপভ্রংশে ও বাংলায় হয়েছে 'ও'। 'উহা' - এর আগমন ঘটেছে সংস্কৃত 'অবস্য' থেকে। যা পরবর্তীতে অপভ্রংশে 'ওহ' হয়ে যায় এবং সবশেষে 'উহা' রূপে মধ্য ও আধুনিক বাংলায় প্রবেশ করে। আবার 'উনি' এর আগমন ঘটে সংস্কৃত 'ওহানং' থেকে। যা প্রাকৃতে হয়ে যায় 'উহানং', অপভ্রংশে 'উহঁ' এবং বাংলায় 'উনি'। মানিক দত্তের কাব্যে 'উহাকে' এর পরিবর্তে 'ওহাক' ব্যবহৃত হয়েছে দূর নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে। যথা- 'সেহি সে পারিবে ওহাক দুঃখ দিবার তরে' (১২৫)। বরেন্দ্র অঞ্চলে দূর নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে বর্তমান কালেও 'উয়াক' ব্যবহৃত হয়।

৩। অনির্দেশক (Indefinite) : যে সর্বনামগুলি কোনও অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনির্দেশক সর্বনাম বলে আমরা জানি। যেমন, কেহ, কিছু, কার,কোনো, কেউ, অমুক প্রভৃতি। অনেকসময় একাধিক সর্বনাম পদ একত্রে বসে অনির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে। যখন এইরকম প্রয়োগ ঘটে থাকে তখন তাকে যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন, যে-কেহ, যাহা-কিছু, কোনওকিছু প্রভৃতি। অনির্দেশক সর্বনামগুলির বাংলায় আগমন ঘটেছে মূলত সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃত কয়স্য > অপ. কেহ > প্রা. বা. কেহো > ম. বা + আ. বা কেউ, কেহ। সং. কিঞ্চ > অপ. কিচ্ছ > বা. কিছু। সং. কমনঃ > অপ. কবণ > ম. বা. কমন, কোন > আ. বা. কোন, কোনো, কোন্। মানিক দত্তের কাব্যের কিছু চরণ তুলে ধরে দেখে নিতে পারি আমরা অনির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ বৈচিত্র। যেমন, 'কেহো করে দান পুণ্য ভব তরিবারে' (৯৯), 'কেহ কাটে পাছে বন কেহ কাটে অগ্রে' (১১৭), 'কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহু নাহি জাএ/ কাহার পুষ্কনির জল কেহু নাহি খাএ' (১৩৩), 'কেহু আগে কেহু পাছে কেহু ঘোড়াএ শোয়ার'(১৪০), 'কেও ঘোড় ধাইয়া মারে দুই চারি চাবুক' (১৪৭)। দেখা যাচ্ছে 'কেহ' সর্বনামটির অর্থ অভিন্ন থাকলেও বানানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। 'কেহ', 'কেহো' এবং 'কেহু' 'কেও' এই চার প্রকার বানানই রয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। 'কার হস্তে কাটারি কুড়ালি কার হস্তে দাও' (১১৭), 'কার কথা নাহি শুনে হৈল গণ্ডগোল (১৪০) – এখানে 'কারো' অর্থে 'কার' ব্যবহৃত হয়েছে। আবার শুধু 'কার' অর্থেও 'কার'–এর প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, কার যুক্তি পাঞা বাছা জাইছ বিদেশ' (২৯৩)। ছন্দের খাতিরে পাশাপাশি দুইটি চরণে দেখা যায় কোথাও 'কার' আবার কোথাও 'কাহার' ব্যবহৃত হয়েছে। যথা - 'কার লব নারী আমি কার লব ধন/ আমার জগত্যা ভাঙ্গে কাহার শাসন' (১১৮)। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বে ছয় মাত্রা করার খাতিরে 'কাহার' ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। মানিক দত্তের কাব্যে 'কাওকে' বোঝাতে কখনো 'কাখ' আবার কখনো 'কাক' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'কাখ মারে কাখ কাটে কেহু হৈল তল/ য়াওাস ভাঙ্গিয়া গেল হুদুরা মহল' (১৪০), 'কাক মারে কাক কাটে কেহু হৈল তল/ দ্বার ছাড়িয়া পালা এ কালুর নস্কর' (১৪১)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪। **সমষ্টিবাচক** (Inclusive) **:** যে সব সর্বনাম সমষ্টিবাচক ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাদের সমষ্টিবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, সকল, সব, উভয়, সমস্ত প্রভৃতি। এই সবের সঙ্গে বিভক্তি অথবা অনুসর্গ যোগ করে তৈরি হয় সকলের, সবগুলি, সবার চেয়ে, সবার দ্বারা, সবারে প্রভৃতি। মানিক দত্তের কাব্যে সমষ্টিবাচক সর্বনামগুলির প্রয়োগ দেখে নেওয়া যাক— 'তুমি সৃষ্টি কর ধম্ম সকল সংসার' (১), 'শিবের আগে জাঞা মুনি সকল কহিল' (১০), 'এইরূপ করিঞা সকল দ্রব্য নিল' (১২), 'সকল দেবতাগণ দেখিতে আইল' (১৭), 'সকল অসুর হৈল বড়ই প্রচণ্ড' (১৯), 'গুরুকে ভাণ্ডিয়া ধন খাইলাঙ সকল' (২৯৪)। 'সকল'পদের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে মানিক দত্তের কাব্যে যে রূপগুলি পাওয়া যায় সেইগুলি হল, 'সকলি', 'সকলিকে', 'সকলির'। সমস্তটাই অর্থে 'সকলি', সকলকে অর্থে 'সকলিকে' এবং সকলের অর্থে 'সকলির' ব্যবহৃত হয়েছে সেই কাব্যে। যথা- 'দুইজনে আনন্দে সকলি খাইল' (১২), 'তোমার রাজাকে খাব সেনা সকলি' (৩৩৫), 'সকলিকে কহিল সাজিতে' (১৩), 'দেখিয়া কতাল ভএ বলে সকলিকে' (৩৩৫), 'ক্রোধে বলে কতাল পাইক সকলিকে' (৩৩৭), 'সকলির মন আনন্দিত' (১৪)। প্রত্যেকে বা সকলে বোঝাতে মানিক দত্তের কাব্যে 'সকলিএ' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'শিবের চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে' (১৪)। 'সব' সর্বনাম পদ দ্বারাও অনেক সময় সমস্ত বোঝানো হয়েছে। যেমন, 'কামদেব ডাকিঞা কহিল সব কথা' (৮), 'সভার মধ্যে ভীম জাঞা সব ভার থুল্য' (১২), 'চতুর্থ মজিলে সাধু সব এড়াইল' (২৪১)। সমষ্টিবাচক সর্বনাম হিসেবে আমরা মানিক দত্তের কাব্যে 'সৰ্ব্বজন' পদেরও উল্লেখ পাই। যথা - 'জল সাধে নারীগণ ঘরে আইল সৰ্ব্বজন' (১৩), 'হৃদয়ে ভাবিয়া কথা বুঝ সৰ্ব্বজনে' (১৬)।

৫। **সংযোগবাচক** (Relative) **:** যে সব সর্বনামপদের দ্বারা দুই বা তার বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সংযোগ বোঝায় তাদের সংযোগবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, যাহা, যে যে, যা যা প্রভৃতি এবং সম্মাননীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি, যাঁহারা, যাঁহাকে, যাঁর প্রভৃতি। আবার অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে যা, যাহা, যেটা, যেটি, যেগুলো, যে সমস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় একটি সংযোগবাচক সর্বনামপদ তার ভাবের পূর্ণতার জন্যে অপর একটি সংযোগবাচক সর্বনামের অপেক্ষায় থাকে। এই ধরণের সংযোগবাচক সর্বনামকে সাপেক্ষবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, যে-সে, যা-তা, যিনি-তিনি, যাহা-তাহা, যার-তার প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবির রচনায় সংযোগবাচক সর্বনাম হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখে নিতে পারি— 'কাল পেচা লেখিল জে খোকের ভিতরে' (৮৬), ''মৎস্য রাঙা লেখিল জে ছোয়ে মৎস্য ধরে' (৮৭), 'বউ পক্ষ লেখিল জে জলে চরে ভেলা' (৮৮), 'জে জন দরিদ্র হএ ধন দেএ তারে' (১৩৩), 'জে জন পালন করে সে জন জননী' (২৫), 'জে মাএ ধ্যান কর সেহি মাএ আমি' (১৫৫), 'জে দিনে সামী বিভা করিল তোমারে/ সেই দিনে বন্দি জাঞা হৈল রাজঘরে' (২২৪), 'জাখে কৃপা কৈল মা মঙ্গলচণ্ডীগণ' (৬৪), 'অনাদ্য ঠাকুর জারা কথা পালন করে তারা' (১৩৬), 'স্বামী জার জয়ধর পুত্র তার মালাধর' (১৮৬), 'জেহি মন্ত্র জপ তুমি সেহি মাত্র আমি' (১৬৮), 'জেই শিব সেই দুর্গা এক মনে জানে' (১৮০), 'জেই বর চাহ তাহা তোরে দেই আমি' (১৭৬), 'প্রথমে জে অন্ন খায় তার লাগে ধান' (২২৩)। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিক দত্তের কাব্যে সংযোগবাচক সর্বনাম হিসেবে 'জে'ব্যবহৃত হচ্ছে 'যে' এর স্থলে। বর্গীয়-জ দিয়ে জদি, জখন, জার প্রভৃতি শব্দেরও বানান লেখা আছে সেই কাব্যে। আমরা জানি সংস্কৃত 'যঃ', 'যকঃ', 'যৎ' থেকে প্রাকৃতে সৃষ্টি হয় 'জো', 'জত্র', 'জং'। অপভ্রংশে তা হয় 'জু', 'জি', 'জ', 'জং' এবং প্রাচীন বাংলায় 'জে', 'জ'। সবশেষে মধ্য ও আধুনিক বাংলায় তা পরিণত হয় 'জে' এবং 'যে' তে। তাই শুধু মানিক দত্তের কাব্যে নয় মধ্যযুগের অপরাপর কাব্যেও বর্গীয়-জ দিয়ে 'যে' এর বানান পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের কথ্যভাষায় চ-বর্গীয় চারটি প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনির[১৩] উচ্চারণে বর্তমানেও শিসধ্বনির প্রভাব টের পাওয়া যায়।

৬। **প্রশ্নবাচক** (Interrogative) **:** যেসব সর্বনাম দ্বারা কোনও কিছু জানতে চাওয়া হয়, তাদের প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। যেমন, কে, কী, কেন, কোন, কারা, কোনগুলি, কে কে প্রভৃতি। প্রশ্নবাচক প্রচুর সর্বনামের দৃষ্টান্ত আমরা মানিক দত্তের কাব্যে পাই। যথা- 'কি করিতে পারে তোর চান্দো সদাগর' (২৪৮),'কত যুগ বএ গেল বল তার কথা' (১), 'কোন বা বান্যার নারী কত ধৰ্ম্ম করে' (২৫৫), 'কেনে আগমন মুনি বল বিবরণ' (৯), 'কেন হৈলা তুমি দুই কুল খাঁ খাঁ কারি' (৯৩), 'তবে কেন এত লোক তেজিবে জীবন' (১৫৫), 'তুমি তাখে বন্দি কর কেনে' (১৬৪), 'আজি কেনে পদ্মাবতি দেখি অমঙ্গল' (৩৩৩),

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

‘জম বলে হনুমান কেনে আগমন’ (৩৫৪), ‘কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে’ (৯), ‘বলে কুনজনে জাবে গরূড়েক আনিবারে’ (৮৯), ‘কুন মেঘের কুন কম্ম আমারে বুঝাও’ (১২২), ‘কুন বা দেবতা এ বর দিল মোরে’ (২৮৫), ‘কুন কাজ কিবা হেতু বল বিবরণ’ (৩৫৪), ‘শিব বোলে এমত কর্ম্ম কোন দেবে করে’ (৪৩), ‘সাধু বলে পরীক্ষাএ কোন প্রয়োজন’ (২৪৯), ‘কোন বা বান্যার নারী কত ধর্ম্ম করে’ (২৫৫), ‘ভাঙ্গের খীপীরে কোথা আছিলে বসিয়া’ (৮১), ‘কোথাহ পশুর সনে না হৈল দরশন’ (৮১), ‘এমন মোহন বেশে কোথাতে জাহ তুমি’ (৯১), ‘প্রভু কেবা তোমাক বন্দি কৈলে কেবা তোমাক উদ্ধারিলে’ (১৬৫), ‘মনতে রহিল ব্যথা কাহাকে কহিমু কথা’ (১৬৭), ‘কেমতে রন্ধন করি তাহা নাই জানি’ (২৫৬), ‘কার সনে যুদ্ধ হবে হেন প্রায় আখি’ (৩৩৩) । উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ‘কি’, ‘কত’, ‘কেনে’, ‘কেন’, ‘কুন’, ‘কোন’, ‘কোথা’, ‘কোথাহ’, ‘কোথাতে’, ‘কেবা’, ‘কাহাকে’, ‘কেমতে’, ‘কার’ সর্বনামগুলি প্রশ্নবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মানিক দত্তের কাব্যে। কিছু ক্ষেত্রে একই অর্থ বহনকারী একটি সর্বনাম একাধিক রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। যেমন, কেনে/কেন, কুন/কোন। কোথা এবং কোথাতে দ্বারা একই অর্থ ‘কোথায়’ প্রকাশিত হয়েছে। তবে ‘কোথাও’ বোঝাতে ‘কোথাহ’ এবং ‘কেমন করে’ বোঝাতে ‘কেমতে’ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। আত্মবাচক (Reflexive) **:** যেসব সর্বনামে ক্রিয়া সম্পাদক হিসেবে কর্তা নিজেকেই বড়ো করে দেখায়, তাদের আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন - আপনি, নিজ, খোদ, স্বয়ং প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবির কাব্যেও আমরা বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাই আত্মবাচক সর্বনামের। যথা- ‘আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজরূপ হৈল’ (২), ‘আপুনি করহ গিঞা পশুর সৃজন’ (৪২), ‘আপন গৃহেতে হইল বীরের গমন’ (৭৭), ‘আপনার গৃহে বীর দিল দরশন’ (৮০), ‘জে নাম স্মরিলে বাছা আসিব আপুনি’ (১১৫), ‘নিজ নামে স্মরিলে বাছা আসিব আপনি’ (১১৬), ‘শিবারূপে বাহিরাএ আপনে শিবানী’ (১৪৭), ‘আপনার বল কিছু না বুঝিআপনি’ (১৫০), ‘সেহ বল ভগবতী লইল আপনে’ (১৫২), ‘আপন উদরে দেবী আপনে বিদারে/ আপনার রুধির আপনে পান করে’ (১৫৩), ‘আপনার গৃহে চলে কেতু আহিড়ি’ (১৫৪), ‘সাধিলে আপন কার্জ্য কার কেহু নয়ে’ (১৭৪), ‘শৃঙ্গার করিল তেহো আপনার সুখে’ (১৮১), ‘আপনার দেশে আস্যা দরশন দিল’ (২৪১), ‘রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে’ (২৮৭), ‘আপনে ছলিছ মাতা শ্রীমন্ত সাধুকে’ (৩৩৩), ‘আপুনি মরিল সেনা আপনার অস্ত্রতে’ (৩৫০), ‘সোমবারে সর্ব্বলোকে পূজিহ আপুনি’ (৩৭৬)। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিক দত্তের কাব্যে আত্মবাচক সর্বনামপদের রূপবৈচিত্র। ‘আপনি’, ‘আপনে’, ‘আপন’, ‘আপুনি’, ‘আপনার’ সর্বনামগুলি সেই কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে আত্মবাচক সর্বনাম হিসেবে।

৮। পারস্পরিক (Reciprocal) **:** এই ধরণের সর্বনামকে অনেকে ব্যতিহারিক সর্বনামও বলে থাকেন। এই সর্বনামগুলি অন্যের প্ররোচনা ছাড়াই স্বেচ্ছায় ব্যবহৃত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ধরণের সর্বনাম হিসেবে ‘আপস’ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বনামের দ্বারা পারস্পরিকতা বোঝায়। আপনা-আপনি, নিজে-নিজে এই ধরণের সর্বনামের দৃষ্টান্ত। তবে মানিক দত্তের কাব্যে আমরা পারস্পরিক সর্বনামের সন্ধান পাই নি।

বাংলা সর্বনামপদগুলির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আজও ঐকমত্য হয় নি ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে। অনেকে স্বয়ং, খোদ, আপনা-আপনি প্রভৃতিকে সর্বনাম বলতে গররাজি। কেননা, এই শব্দগুলির বিভক্তিযুক্ত ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় না। আমরা জানি যে, পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদের বারংবার ব্যবহার পরিহার করার জন্যেই সর্বনাম পদের সৃষ্টি। কিন্তু খেয়াল করলে বোঝা যায়, এমন অনেক সর্বনাম রয়েছে যাদের ব্যবহার করতে হলে পূর্বে বিশেষ্য পদের প্রয়োজন হয় না। যেমন- আমি, আমরা, তুমি, তুই, আপনি প্রভৃতি। তাহলে সংজ্ঞানুযায়ী এই শব্দগুলি কিন্তু সর্বনামের আওতায় পড়ে না। আবার সর্বনাম যে শুধু বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাও নয়, অনেক সময় একটি বাক্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় । যেমন, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। এ আমি বিশ্বাস করি না। এখানে ‘এ’ পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যের অর্থ বহন করছে। তাহলে ‘এ’ তো সংজ্ঞানুযায়ী সর্বনাম হতে পারে না। তাহলে বলা যায়, সময় এসেছে সর্বনামের সংজ্ঞা পরিবর্তনের। নইলে এই মতানৈক্য কখনোই মিটবে না। আর আমাদেরও সময় এসেছে আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করে এখানেই সমাপ্তিরেখা টানার।

Reference:

১. সেন, সুকুমার : চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে দু'চার কথা, ওঝা শ্রীসুনীলকুমার সম্পাদিত, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ১৩৮৪

২. Grierson,G.A : Linguistic Survey of Bengal,2007. vol.I, kreativmind, Kolkata, P. 143

৩. সেন, সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, ২০০১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,পৃ. ২০৫

৪. হাই, মুহম্মদ আবদুল : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, পঞ্চদশ মুদ্রণ ২০১২, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২৪

৫. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৬. Grierson, G.A, ibid, P. 135

৭. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৮. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২০১

৯. ভৌমিক, ডক্টর নির্মলেন্দু : প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা, ১৯৮৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৩৫

১০. সেন, সুকুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

১১. ওঝা, শ্রীসুনীলকুমার সম্পা., মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা অংশ, ১৩৮৪, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পৃ. ৪৪

১২. বিশ্বাস, ড. সুখেন : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১২, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭০

১৩. হাই, মুহম্মদ আব্দুল যুক্তি সহকারে চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলির নাম তালব্য ধ্বনি না বলে প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলেছেন। এই বিষয়ে তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়টি দেখতে অনুরোধ জানাই। মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।